পাখী আমার নীড়ের পাখী

সকালের আলো উঠি উঠি করছে ভালো করে তখন কাকেরই ঘুম ভাঙ্গেনি সেই কাকভোরে পাখী নাস্তা সারছে। 'মা আর চাইড্ডা পান্তা থাকলে দেনা খাই, জব্বর খিদা লাগছে আজ' পাখী বলল তার মাকে। 'এই ল, এই চাইড্ডা ভাতই আছে তুই খা, আমি মাতবর বাড়ীত যাইয়া বাসি পান্তা কিছু খাইয়া লমুনে, মাতবরের বউ এর কাছ থেকে চাইয়া লমুনে দুগগা' বলল, পাখীর মা পাখীকে। 'তয় থাক মা, তুই ই খা, কে জানে এই সাত সকালে মাতবরের বউ এর মেজাজ জানি কেমন থাকবো, তরে কিছু দিবো না কি না দিবো। আইজ আবার ধান হিদ্ধ আছে, কিছু না খাইলে তুই আবার গতরে বল পাইবি না'। এই সাত সকালে কটা পান্তা মুখে দিয়েই ছুটবে ন / দশ বছরের পাখী আর তার মা কাজে। গ্রামের মাতবরের বাড়ীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটে পাখী আর তার মা। পাখীর মা মাতবরের বাড়ীর গৃহস্থালীর কাজ করে আর পাখী সবার ফুট ফরমাস খাটে সে বাড়ীতে। বিনিময়ে দু-বেলা খেতে পায় তারা দুজন আর বছরের কাপড়ের সাথে মাস গেলে নগদ সামান্য কটা টাকাও। এ ছাড়াও কলাটা, মুলাটা মাঝে মধ্যেই মনিব গিন্নীর মেজাজ ভালো থাকলে জোটে বৈকি। আর সুযোগ বুঝে পাখীও বাড়ীতে আসা যাওয়ার ফাকে কিছু সব্জি, ফল এদিক ওদিক করে নিয়ে যায় সবার চোখ বাচিয়ে। এই টাকায় আর এদিক সেদিক করে যা জোটে তাতে সংসার চলে বাকী সব সৎ ভাইবোন আর সৎ বাবাকে নিয়ে পাখীর আর তার মায়ের। ন / দশ বছরের লিকলিকে পাখী এমনিতে বয়স আর বাঙ্গালী মেয়েদের গড়নের তুলনায় বেশ লম্বা কিন্তু অভাবের কারণে স্বাস্থ্য আর শ্রী নেই। কিন্তু তার মাঝেও গড়ন-গাড়ন বেশ ভালো। জন্মের পর বাবা মারা যাওয়াতে পাখীর মা আবার বিয়ে করলেন, সেই ঘরে গোটা পাচেক ভাইবোন নিয়ে পাখীদের সংসার। বাবা একসময় কাজ করেতো বাকী সারা সময়ই বেকার ঘুরে, সংসার নিয়ে তার মাথাব্যথার চেয়ে নিজের মান সম্মান নিয়ে তার বেশী দুশ্চিন্তা। কোন কাজ করলে মান সম্মান হারানোর সম্ভাবনা আছে সে উপদেশ দিয়ে বেড়ায় পাখী আর তার মা কে। সংসারের চাপ তাই পাখী আর তার মায়ের উপর। মাতবরের বাড়ীতে ধান এসেছে সকাল সকাল যেতে হবে, ধান এসেছে এত্তো, এখন দেরী করলে মাতবর গিন্নী আর আস্ত রাখবে না। তাড়াতাড়ি ছুটল পাখী মাকে নিয়ে, ধান আসার বাড়তি ঝামেলা ছাড়াও হাজার কাজ থাকে মাতবরের সংসারে। এই কুটনো কুটোতো এই পিঠা বানাও, নয় এখুনি আচার মাখোতো এই মুড়ি ভাজো। কিন্তু মাতবরের বাড়ীর শত কাজের ভীড়েও পাখীর দুচোখ অনেক স্বপ্ন দেখে। সব কাজে শেষে রাতে যখন পাখী একটু ঘুমানোর সময় পেতো তখন হয়তো নামত ঝমঝম বৃষ্টি, কিন্তু তখনও শত ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়া চালার দিকে চেয়ে পাখী অনেক স্বপ্ন বুনত নিজের জীবন আর সংসারের ছবি পালটে ফেলার। অনেক অনেক কাজ করবে সে, অনেক টাকা উপার্জন করবে যা দিয়ে সে পালটে ফেলবে জীবন নদীর গতিপথ। নিজেদের ছোট একটি ঘর থাকবে, যার চালা থাকবে নিছিদ্র, বৃষ্টির পানি পড়ে এভাবে সবাই আর কাকভেজা হতে হবে না, গাই থাকবে, হাস-মুরগী থাকবে, নিজেদের ছোট সব্জি বাগান থাকবে, তাকে আর মাকে রোজ রোজ পরের বাড়ী দাসীগিরি করতে ছুটতে হবে না, এগুলো দেখাশোনা করেই আরামে আহ্লাদে কেটে যাবে বাকী জীবন। এই মাতবরের বাড়ির উঠতে বসতে লাঞ্চনার জীবন আর সে মেনে নিতে পারছে না। আধপেটা খেয়ে না খেয়ে পাখীকে কাপড় ধোয়া, থাল বাসন মাজা কি না করতে হয় সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি আর মাকে তো ধান ভানো, ধান সিদ্ধ করো, ঘর লেপো সবই করতে হয়। তার উপরে থাকে মতবর গিন্নী ও তার ছেলে মেয়েদের গালমন্দ সহ নানা অত্যাচার। কিন্তু এভাবে আর নয়।

সবসময় পাখী ভাবতো আর সুযোগ খুজতো কি করে একটু সামানে এগোনো যায়। গ্রামের একে তাকে জিজ্ঞেস করতো কোথায় হাতের কাজ শেখা যাবে? কোথায় শ্রমিক কল আছে যেখানে কাজ পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই পাখীর এই বড় হওয়ার বাসনাকে নিয়ে মজা করতো। আর বরিশালের এই অজ পাড়া গ্রামে বসে একটি অভাবী, অশিক্ষিত মেয়ের পক্ষে আত্ম উন্নতির কোন দিক খুজে পাওয়া কলম্বাসের আমেরিকা খুজে পাওয়ার চেয়ে অনেক দুরুহ কাজ। কিন্তু 'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়', আর পাখীরও তাই হলো। হঠাৎ একদিন পাখীর ঢাকা শহরে চাকুরী করা খালা তিন বছর পর ছুটিতে বরিশালে নিজের গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেলো চকচকে কাপড় জুতো পড়ে। খালাকে দেখতে অনেকটা মাতবর বাড়ীর বউদের মতো লাগছে। খালার চেহারাতেও বেশ চেকনাই খেলা করছে আর কথায় কেমন যেনো বিদেশী টান যা মাতবর বাড়ীর বউদের কথায়ও নেই। ওখানেতো সবাই কথা বলে বরিশালের নিজস্ব ভাষায়। পাড়া পড়শী সবাই ভেঙ্গে এলো খালাকে দেখতে, দেখে গেলো সবাই কিছুটা ইর্ষিত চোখে যেনো। পাখী জানতো তার খালা ঢাকায় থাকে আর তার স্বামী সদরঘাট না কোথায় যেনো রিকশা চালায়। কিন্তু এতো অনেক অন্য ব্যাপার। পাখী খালাকে ধরে পড়ল এই উন্নতির উৎস কোথায় বলতে? নাছোড়বান্দা পাখীর জেদের চোটে খালা বললেন আলো ঝলমল ঢাকা শহরের কথা, সেখানে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, টেলিফোন আছে। ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলে, পাখা ঘোরে, বাসন মাজতে পুকুড় ঘাটে যেতে হয় না ঘরে সিঙ্ক আছে, আছে আরো বিভিন্ন আরাম আয়েশ ও অজস্র সুখ। আরো কতো কতো দুধ, মালাই, বরফ আইসক্রীমের গল্প। পাখীর খালা এক বাসায় কাজ করে সেখানের বিবি সাহেবের দেয়া এ সমস্ত কাপড়-চোপড় আর জুতো,

ফিতে। এ সমস্ত মনোলোভা গল্প শুনে উচ্চাকাঙ্খী পাখী খালাকে ধরে পড়ল তাকে ঢাকা শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর একটা খালার মতো এরকম বাসা খুজে দেয়ার জন্য। খালা একটু প্রথমে দোমনা করছিল কিন্তু পাখীর আগ্রহ দেখে খালা রাজী হলো। পাখীর একথা শুনে পাখীর মা, ছোট ভাইবোনেরা কাদতে বসল কি করে তারা পাখীকে অজানা দেশে দিয়ে থাকবে, সারাদিন পাখীর কাটে ভাইবোনদের দেখাশোনায়, মাতবর বাড়ীর কাজের ফাকে ফাকে পাখী সব ভাইবোনদের উপর নজর রাখে, অসুখ বিসুখে যত্ন সবইতো পাখীর হাতে, পাখী ছাড়া দিন কি করে কাটবে? পাখী সব্বাইকে বোঝালো সেতো চিরজীবনের জন্য যাচ্ছে না, সব্বার ভালো থাকার ব্যবস্থা হলেই পাখী চলে আসবে আবার নিজগ্রামে। অনাগত সুখের-স্বপ্নের মায়া সবাইকেই খানিকটা দ্রবীভুত করল, সামনেতো খালার জলজ্যন্ত উদাহরনতো আছেই তারপরও মন মানতে চায় না। কিন্তু অবশেষে পাখীর জেদ দেখে সবাই রাজী হলো। ছায়াঢাকা- পাখীডাকা, ছোটগ্রাম - স্নেহমাখা এর মায়া ত্যাগ করে খালার সাথে ষ্টিমারে উঠে চলল পাখী জন্মস্থান ত্যাগ করে সোনার হরিনের পিছনে। দুচোখ ভর্তি স্বপ্ন আর জীবনের প্রতি প্রচন্ড মায়া নিয়ে মনের ডানায় ভর দিয়ে পাখী যেনো ভেসে চলল। পিছনে ছেড়ে গেলো পাখী অজস্র মায়া ভরা অশ্রুসিক্ত চোখ। ষ্টিমারে অনেকেই ঘুমালো, অনেকটা পথ দুদিনের যাত্রা কিন্তু অনাগত সুন্দর ভবিষ্যত আর সবাইকে ছেড়ে আসার ব্যথা পাখীকে দুচোখের পাতা এক করতে দিল না এক মুর্হুতের জন্য। উত্তেজনায় টান টান পাখীকে দেখে বিধাতা অলক্ষ্যে কি হাসি হেসে ছিল বিধাতাই জানে।

অবশেষে ষ্টিমার এসে থামল পাখীর কাংখিত স্বপ্নের ঢাকা শহরে। খালা পাখীকে বগল দাবা করে নিয়ে ছুটলেন নিজের কাজের ঠিকানায় সেখানে যেয়ে খালার বিবিসাহেবকে খালা সব কথা খুলে বলতেই তিনি ফোন করলেন তার ছোট বোনের বাসায়। কদিন আগেই খালার বিবিসাহেবের ছোটবোনের বাচ্চা হয়েছে তিনি তার বাচ্চা রাখার জন্য এমনি একজন ছোট মেয়ে চাইছিলেন। আর কি সোনায় সোহাগা। সাথে সাথে খালার বিবিসাহেবের ছোটবোন এসে পাখীকে গাড়ীতে করে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো পাখীর স্বপ্নের কাংখিত জায়গায়। প্রথমে পাখীকে ঢাকার উপযোগী বানিয়ে তোলার জন্য আগে থেকে ঢাকায় থাকা তুলনামুলকভাবে স্মার্ট কাজের লোকদের কাছে ট্রেনিং এ পাঠানো হলো। তারা পাখীর নোংরা জামাকাপড় সব ফেলে দিয়ে পরিস্কার জামা কাপড় পড়তে দিলো, মাথার জঙ্গল কেটে সাফ করল উকুনের দোহাই দিয়ে, পাখীকে ডেটল পানি দিয়ে মেজে মেজে গোসল দিল নইলে এই ব্যকটেরিয়া ভাইরাসের জীবন্ত বাসা ছোট বাবুর জন্য আবার নতুন কি রোগ সৃষ্টি করবে কে জানে? এই বাড়ীর নতুন বাবু কি সুন্দর তুলতুল ফুলফুল। ফর্সা ছোট ছোট ফোলা ফোলা হাত-পা নেড়ে হামাগুড়ি দেয়, সব বিদেশী সাবান, শ্যম্পু, তেল দিয়ে হয় তার পরিচর্যা। তাকে তো আর এমনি এমনি কারো হাতে তুলে দেয়া যায় না। পাখীর ড্রেস রিহার্সেল এর সাথে চলল অন্যান্য আনুষাঙ্গিক প্রশিক্ষন। যেমন লাইটের সুইচ অন / অফ করা, ফ্রিজ খোলা বন্ধ করা, বাচ্চার প্র্যাম চালানো, ঢাকার ভাষায় কথা বলা ইত্যাদি ইত্যাদি। পাখী তার মালিকের এতবড় বাড়ীর সাজানো গোছানো আধুনিক পরিবেশ দেখে বাকহারা হয়ে গেলো। মসজিদের হুজুরের কাছে সে পরকালের বেহেস্ত দোজখের গল্প শুনেছে, এই বাড়ীতে বেহেস্তের মতো ঠান্ডা- গরম, আলো-অন্ধকার করার সব ব্যবস্থা আছে মানুষের নিজের হাতে। ইচ্ছে হলে ঠান্ডা বাতাস খাও, যতক্ষন ইচ্ছে আলো জ্বালাও, ঠান্ডা পানি খাও, ইচ্ছে হলেই তা পুরন হয়। তাদের মতো আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকতে হয় না ঠান্ডা-গরম কিংবা অন্যান্য আরামের জন্য। পাখীর এই বিস্ময় দেখে অন্যান্য সহকর্মীরা হাসে আর বলে, ‘হবায়তো ঢাকা শহর আইলি থাক, আরো কত কি দেখবি’। তারপরও এই প্রাচুর্য ভরা বাড়িতে কখনও কখনও পাখীর বেশ মন খারাপ হতো, মনে পড়ত গ্রামের খোলা আকাশ, শান্ত পরিবেশ, মাতবর বাড়ীর কোলাহল, পাখীর ডাক আর মায়ের শান্ত কোমল কোল। অনেক অনেক বিস্ময় আর আশা আকাঙ্খা নিয়ে আসা পাখী ওর অন্যান্য সহকর্মীদের মতো ওই বাড়ীতে আস্তে আস্তে স্থায়ী হয়ে গেলো। ওর মুখ্য কাজ হলো পুতুল পুতুল বাচ্চাটার পেছন পেছন থাকা, ওর সাথে খেলা করা, ওর জামা কাপড় গুছিয়ে রাখা আর সাথে বাড়ির কারো দুএকটা টুকটাক ফরমাশ খাটা। পাখী মনের আনন্দ নিয়েই কাজ করতে থাকে মনিবের বাড়ী। মাঝে মাঝে খালার সাথে দেখা হয়, ফোনে কথা হয়। গ্রাম থেকে পাখীর চিঠি আসে, পাখীর মা মাতবর বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দিয়ে চিঠি লিখিয়ে পাঠায় - পড়ায়, যদিও মাতবর বাড়ির লোকজন পাখীর চলে আসাটাকে মোটেও ভালো চোখে নেয়নি কিন্তু তারপরও পাখীর মায়ের কান্নাকাটিতে ছেলেমেয়েরা এতটুকু করে। পাখীও তার মনিবের বাসার লোক দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিজের খবর দেয়। বাচ্চাটাকে রোজ দিন যত্ন করতে করতে এক সময় পাখী লক্ষ্য করল যে বাচ্চাটাকে পাখী নিজের ভাইবোনদের মতোই ভালোবাসতে শুরু করেছে সে। বাচ্চাটা ব্যথা পেলে পাখী কাদতে থাকে, বাচ্চাটাকে কেউ বকলে পাখীর কষ্ট হতে থাকে। আস্তে আস্তে পাখী যেনো অনেকটা এ বাড়ীর সদস্যদের মতোই হয়ে গেলো, বাড়ীর জন্য মন কেমন করাও কমে এলো। বাচ্চাটাও পাখী আপু ছাড়া থাকতে চাইতো না, নিজের মায়ের পরে সবচেয়ে বেশী পাখী আপুকেই চাইতো ও নিজের কাছে।

আস্তে আস্তে সময় যেতে থাকলো, বছর ঘুরে এলো, পাখী বাড়ী যাওয়ার জন্য উতলা হয়। বেতনের টাকা আর বকশিস মিলে অনেক জমা হয়েছে। এবার পাখীর ঘর বানানোর পালা। পাখী তার মনিবকে তার সংকল্পের কথা জানালে পাখীর মনিব তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রায় দুবছর পর চললো পাখী নিজের বাড়ীতে তার খালার সাথে। সাথে অনেক বড় সুটকেস, তাতে ভর্তি উপহার কাপড়-চোপড় ছোট ভাইবোনদের জন্য পাওয়া মনিব গিন্নী থেকে, মনিব গিন্নীর ছেলে মেয়ের অসংখ্য পুরোন কাপড় পাখী তার সুটকেসে জমিয়ে রেখে ছিল বাড়ীতে নেবে বলে, তার সাথে আছে পুরোনো খেলনা, বাসন-কোসন, বিছানার চাদর ইত্যাদি ইত্যাদি। যা মনিবের বাড়ীতে পুরোনো বা বাতিল হতো তাই পাখী অন্যান্য চাকরদের সাথে নিজেও নিজের ভাগ নিত। কখনও বা খালাম্মার (মনিব গিন্নীর) কাছে নিজেই অগ্রীম আবেদন জানিয়ে রাখতো, এই শাড়ীটা বা খেলনাটা পুরোন হলে কিন্তু আমাকে দিবেন। খুশীতে আত্মহারা পাখী ডানায় ভর দিয়ে যেতে লাগলো। ষ্টিমার এসে যখন ঘাটে পৌছুলো তখন পাখী যেনো দৌড়ে বাকী পথ পেরুবে। ঘাট থেকে বাড়ী যেতে যেতে পথের দুধারে ঘটে যাওয়া এদুবছরে কিছু পরিবর্তন পাখী দেখলই না, কারণ পাখীর মনতো পরে রয়েছে নিজের ভিটেতে। তবে হালকা মনে এটুকু ভাবল ইট পাথরে ঘেরা ধনী ঢাকা থেকে নির্মল দরিদ্র গা অনেক সুন্দর আর নিবিড়। বাতাসের বেগ নিয়ে বাড়ী পৌছে পাখী প্রথমেই সবার সাথে কুশল বিনিময় করল। কিন্তু যে পাখী ঢাকা গিয়েছিল আর যে পাখী দু-বছর পর ফেরত এলো তাতে বিস্তর তফাৎ। পাখী দেখতে একদম পরীর মতো সুন্দর হয়ে গেছে, মাতবর বাড়ীর মেয়েদের চেয়েও ফর্সা, সুন্দর, গোলগাল স্বাস্থ্য। কথা বলে সুন্দর করে, কাপড় পরে অন্যরকম করে, সারা গায়ের লোক পাখীকে দেখতে এলো আর পাখী চাকরী করে পরিবারের সবার জন্য এতো নাম না জানা বিদেশী জিনিস নিয়ে এসেছে যে সবাই দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল। পাখী বলল এবার তার বা-মাকে ঘরের চাল ছাওয়ার কথা। যে কথা সেই কাজ, দুদিন পর থেকে পাখীদের ঘর ছাওয়র কাজ আরম্ভ হোল। প্রায় দশদিন ধরে ঘর ছাওয়া ও মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে, পাখীর আনন্দ যেনো আর বাধ মানে না। অনেক দিনের স্বপ এখন বাস্তবের রুপ পেয়েছে, পাখী বাড়ীর চারপাশে ঘুরে আর চেয়ে থাকে, চেয়ে চেয়ে যেনো তবু পাখীর আশ মিটে না। সময় বয়ে যায়, এখন পাখীর আস্তে আস্তে ফেরার পালা। পাখীর ছোট ভাইবোন এখন একটু বড় হয়েছে, পাখীর ইচ্ছে অনুসারে ওদেরকে স্কুলে দেয়া হোল, গ্রামের পাশের বাজারে পোষ্টঅফিস আছে তাতে এ্যাকাউন্ট খোলা হলো যাতে মাস মাস পাখীর বেতনের টাকা বাড়ীতে মানি অর্ডার করে পাঠানো যায়। আর পাখী মাকে ঠিকভাবে বলে এখন থেকে পাখীই টাকা পাঠাবে পাখীর মা যেনো আর মাতবর বাড়ী কাজে না যায়। গ্রামের অনেকেই পাখীর উন্নতি দেখে ভাগ্য ফেরানোর জন্য পাখীর সাথে ঢাকা আসতে চায়, পাখী তার মনিব গিন্নীর কথা অনুসারে দুজন নিজের আত্মীয় বাছাই করল নিজের সাথে নিয়ে আসার জন্য। আবার পাখী রওয়ানা হলো ঢাকা খালাম্মার জন্য পিঠা, তেতুল, আচার সাথে নিয়ে। এবার আর আগের মতো এতো কান্নাকাটি হলো না, পাখীও স্টীমারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এলো মনে অনেকটা প্রশান্তি নিয়ে।

ঢাকায় এসে আবার সেই বাধা নিত্ত-নৈমিত্তিক জীবন এখন বাচ্চা একটু বড় হয়েছে, পাখীরও কাজ কমে এসেছে। তাই বাচ্চা রাখার সাথে সাথে পাখী ঘরের অন্যান্য কাজও শিখতে থাকে, করতে থাকে। পাখীর বেতন নিয়মিত প্রতি দু-তিন মাস অন্তর অন্তর পোষ্টঅফিসের মাধ্যমে পাখীর পরিবারের কাছে পৌছে যায়। এভাবেই দিন যাচ্ছিলো। হঠাৎ পাখীর মা বরিশাল থেকে পাখীর ছোটবোনকে নিয়ে ঢাকা এসে উপস্থিত হলেন চিঠির ঠিকানা ধরে, পাখীতো আনন্দে আত্মহারা আর পাখীর মালিকপক্ষ ও খুশী তাহলেতো পাখীর আর বাড়ী যাওয়ার প্রয়োজন ও তেমন নেই। পাখীর মা ই এসে পাখীকে দেখে যাবেন। মালিকের বাসায় তারা বেশ কদিন বেড়ালেন, ঢাকা শহর দেখলেন, ডাক্তার দেখালেন, একটু বাজার সদাই করলেন তারপর বাড়ী ফেরার পালা। বাড়ী ফেরার সময় দেখা গেলো পাখীর বোন আর ফিরে যেতে চায় না বরিশাল, ও ঢাকায় থাকবে আর কাজ করবে পাখীর মতো। পড়াশোনা করবে না। পাখীর শত অনুনয়-বিনয় ও ছোটবোনের মন গলাতে পারল না, এ ঘটনা থেকে বেরিয়ে এলো পাখীর অজানা অনেক তথ্য যা পাখীর মনকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলো। পাখী ভাইবোনকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছিল আর স্বপ্ন বুনছিল ভাইবোনকে অন্যভাবে গড়ে তোলার, পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করার সেইজন্য কষ্টার্জিত আয় সব বাড়ী পাঠাচ্ছিল কিন্তু ভাইবোনরা কদিন স্কুলে যেয়েই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল, পড়াশোনা তাদের ভালোলাগে না, পাখীর টাকায় এদিক ওদিক ঘুড়ে বেড়ানো, ভালো জামা কাপড় পড়া, মেলা দেখা, ভালো খাবার খাওয়া ইত্যাদি চলছিল। স্বপ্ন ভঙ্গের কষ্টে আকুল হয়ে পাখী কাদতে লাগল, নিজের ভাগ্যকে দোষারপ করতে লাগল। তারপর রাগ করে বাড়ীর সাথে যোগাযোগ বন্ধের কথাও বলল। পাখীর ছোটবোন মনিবের অন্য আত্মীয়ের বাসায় কাজ নিয়ে ঢাকাতেই থেকে গেলো আর পাখীর

মা চোখ মুছতে মুছতে বিদায় নিল। পাখী রাগ করে বাড়ী যাওয়া বন্ধ করলেও পাখীর মা তার বোন আর দুই মেয়েকে দেখতে প্রায়ই ঢাকা আসা যাওয়া করতে লাগলেন আর অসুখ-বিসুখের কথা একথা ওকথা বলে প্রায়ই দুমেয়ের বাড়ী থেকে টাকা পয়সা নিতে লাগলেন। আগে যারা বছরে পাচশো টাকা চোখে দেখতেন না তাদের এখন প্রায় প্রতি দুমাস তিনমাস অন্তরই এটাকার বিশেষ দরকার পড়তে লাগল।

এভাবেই পরিবারের সাথে নানা ঝগড়া, অশান্তির মধ্যে দিয়ে পাখীর সময় কাটতে লাগল। লম্বা, চওড়া পাখী খুব অল্পসময়ের ব্যবধানে বড় হয়ে উঠলে পাখীর মা আবদার করলেন পাখীর মনিব পক্ষকে দেখেশুনে তারাই যেনো পাখীর একটা বিয়ে দিয়ে দেন, পাখীতো তাদের মেয়েরই মতো। বাবাহীনা, পরিশ্রমী মিষ্টভাষী পাখীর প্রতি তার মালিকপক্ষ খুব সন্তুষ্টই ছিলেন। তারা সানন্দেই রাজী হলেন। বিয়ের কথায় যেকোন মেয়ের বুকেই গুড়্গুড় করে উঠে, মুখে অকারন লাল ছোপ পড়ে, পাখীও তার ব্যতিক্রম নয়। পাখী যেনো নতুন জীবনের স্বপ্নে, নতুন সুখের আশ্বাসে হাওয়ায় ভেসে চলছিল। মালিকপক্ষ তাদের কোম্পানীতে কর্মরত একজন নির্ভেজাল, পিতৃ-মাতৃহীন তরুনের সাথে পাখীর মা-খালা এবং পাখীর সম্মতিক্রমে বিয়ে ঠিক করলেন এবং বেশ ধুমধাম করেই লোকজন ডেকে সোনা গয়না দিয়ে পাখীর বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর পাখী পুরনো সব দুঃখ ভুলে নিজের নতুন জীবন গড়ার জন্য আবার পুরো উদ্যম নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। বাবা-মায়ের সংসার টেনে তুলতে পারেনি তাতে কি হয়েছে, এ তার নিজের সংসার, নিজের জীবন এতে লাগিয়ে দিয়ে টেনে তুলবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাখী নিজে বাড়িতে সেলাই এর কাজ করতে লাগল, হাতের কাজ করতে লাগল, স্বামী চাকুরী করছিল বেশ ভালোই চলছিল। মাঝে মাঝে পাখী সেজেগুজে মনিবের বাড়ী বেড়াতে আসত, হাত নেড়ে-মুখ নেড়ে নতুন জীবনের, নতুন সুখের-স্বপ্নের অনেক বর্ণনা দিতো, মালিকপক্ষও আশ্বস্ত হতো শুনে যাক তাদের আদরের পাখী তাহলে ভালোই আছে। তারপর পাখী এক ফুটফুটে পুত্র সন্তানের মা হলো এবং বেশ আনন্দেই জীবন অতিবাহিত করতে লাগল। সুধী পাঠক, এখানেই শেষ হতে পারত আমাদের পাখীর এই গল্প, সিনেমা কিংবা উপন্যাসে এখানেই শেষ হয় সাধারণত কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। নিয়তি অনেক কিছুই অন্যভাবে লিখে রাখে, যা হওয়ার নয়, তাই হয় আর যা হওয়ার তা হয় না। পাখীর স্বামীর মন মেজাজ আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে থাকল তার আর চাকরিতে মন নেই, সে কাজে দেদার ফাকি দিতে লাগল। কেউ কিচ্ছু বললে সে সহকর্মীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে লাগল অত্যন্ত উচ্চস্বরে, সে মালিকপক্ষের নিজের লোক বলে কথা। কথায় কথায় সে এইকথা বলেই অন্যদের শাসাতে লাগল। প্রথম প্রথম মালিকপক্ষ এগুলোকে আমল দিতে চাইলেন না কিন্তু সবকর্মচারী যখন একসাথে দলবেধে মালিকের কাছে এলো তখন মালিককে বাধ্য হয়েই ব্যবস্থা নিতে হলো। কিন্তু পাখীর মুখের দিকে চেয়ে আর ছেলেটার প্রথম ভুল ভেবে মালিকপক্ষ তাকে অন্য জায়গায় চাকরীর ব্যবস্থা করে দিল। বারবার পাখীর স্বামীর একই ভুল মালিকপক্ষকে অতিষ্ঠ করে তুলল তারা আর পাখীর স্বামীর কাজের কোন সুপারিশ বা ব্যবস্থা করলেন না। আয় রোজগার ছাড়া কি করে এই এতো বড় শহরে পাখীর ছেলে নিয়ে সংসার চলে? কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পাখী কি করা যায় ভাবতে লাগল। কিন্তু অভাবের দিনতো আর ফুরায় না।

অনেক ভেবে পাখী স্বামীকে নিয়ে স্বামীর গ্রামের বাড়ী চলে গেলো, স্বামীর ভিটেতে নতুন করে আবার সংসার পাতলো সংগ্রামী পাখী। চতুর্দিকে নির্মল নীল আকাশ, কুলকুল রবে বয়ে যাওয়া শান্ত নীরব নদী, আর দিগন্ত খোলা সবুজ মাঠ পেয়ে পাখী যেনো অনেকদিন পর আবার নিজের শৈশবকেই ফিরে পেলো। নিজের সামান্য জমি সম্বল করে তার সাথে অণ্যদের জমি ভাগে নিয়ে চাষবাদ শুরু করল পাখীর স্বামী । আর পাখী নিজে শুরু করল বাড়িতে হাস, মুরগীর চাষ সাথে বাড়ীর ভিটেতে সব্জি। চেষ্টার আর খাটুনীর অন্ত ছিল না পাখীর। এবার সুখের আর নিশ্চন্ততার মুখ দেখবেই পাখী। শত হোক শ্বশুরের ভিটে আর সামান্য জমিতো আছেই। পরিশ্রম আর বুদ্ধি দিয়ে এটাকেই দ্বিগুন করে ফেলবে। খুশীর আবেগে কোন কাজকেই পাখীর কাজ মনে হতো না, একজনে সে তিনজনের কাজ করে ফেলত। পাখীকে দেখে বিধাতা অলক্ষ্যে বুঝি হাসে। কিন্তু দেখা গেলো এবার বন্যাতো, সেবার খরা ফসল আসে না ঠিক মতো, তার উপর সাথের ভাগী চাষীদের সাথে ঝগড়া বিবাদতো লেগেই আছে। এই সামান্য জমি থেকে যা আসে তাতে সারা বছরের ভাতের ব্যবস্থাও হয় না আর জমানো বা অন্য খরচতো দুরের কথা। বাকী ছয় মাসতো কি খাবে সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে থাকতে হয় পাখীকে। সাথে যোগ হয় আরো অন্য কষ্ট, পাখীর স্বামী এতো দিনের শহরে থাকা বাবু আর গ্রামে থাকার কষ্ট নিতে চায় না, একদিন কাজে যায়তো দশদিন শরীর খারাপের বাহানা, এ বাহানা ও বাহানা করে ঘরে শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয়। তার কাজকর্মের ব্যবস্থা দেখার চেয়ে বাবুগিরি, ফুটানীতে আর গ্রামের লোকদেরকে বড় বড় গল্প বলাতে সময় যায় বেশী। পাখী এ নিয়ে

অভিযোগ করলে পাখীকে তেড়ে মারতে আসতো, বলত, 'ফকিরনীর মাইয়া, ছিলিতো বাসার কাজের ছেমড়ি তুই বুঝবি কি এসব আমাদের বড় মানুষদের ব্যাপার?' সেটাও ঠিক, পাখী পকেটে যার পয়সা নেই, কাল কিভাবে কাটবে তার কোন স্থিরতা নেই সে লোকের এসব বড় মানুষী চায়ের আডডা, সিনেমা দেখা, তামাক খাওয়া বুঝে না, বুঝে শুধু পরিবার নিয়ে দুবেলা ভাতের নিশ্চয়তা, মাথার উপর নিজের একটা আপন ছাউনী, ছেলেটার একটু পড়াশোনার ব্যবস্থা, অসুখে একটু ঔষধ খাওয়ার নিশ্চয়তা। পাখী আর কতো স্রোতের উলটোদিকে নৌকা বেয়ে যাবে? রোজ রোজের অভাব, স্বামীর সাথে ঝগড়া আর স্বামীর কটুকথা আস্তে আস্তে পাখীর মনের জোর ভেঙ্গে দেয় অনেকখানি। যে স্বপ্ন নিয়ে পাখী শ্বশুরের ভিটাতে পা রেখেছিল তা আজ শত টুকরো হয়ে গেছে। পাখী দিশেহারা। জন্মের পর থেকে একটানা একা সংগ্রাম পাখীকে করেছে কিছুটা বিষন্নও। কিন্তু তারপরও পাখী ভবিষ্যতের কথা ভাবে। পাখীর নিজের জীবন যেভাবেই কেটেছে সে যাক কিন্তু পাখী তার ছেলেকে সেভাবে হারিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই। পাখী ভাবলো বাচতে হবে সে যে ভাবেই হোক, নিজের জন্য আর নয়, ছেলের জন্য। ছেলেকে পড়শোনা শিখাতে হবে, মানুষের মতো মানুষ করতে হবে।

আবার ঢাকা এলো পাখী একা ছেলেকে নিয়ে। আবার বেহুলা ভাসাল ভেলা একা গহীন গাঙ্গে, লক্ষীন্দর আজও মৃত। যে পুরুষ স্ত্রী সন্তানের দ্বায়িত্ব নিতে অক্ষম সেতো মৃতই। গার্মেন্টসের কথা অনেক শুনেছে পাখী। ভাবলো গার্মেন্টস এ তো অনেক পয়সা, এখান থেকেই ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে হবে, ছেলেকে পড়াশোনা করাতে হবে। আবার এসে উঠল ছেলে নিয়ে মনিবের বাসায়। কথা হোল দ্রুত গার্মেন্টস এ চাকুরী জোগাড় করে পাখী নিজের আস্তানা ঠিক করে ছেলে নিয়ে চলে যাবে নিজের আস্তানায়। ঢাকা শহরে সবারই জায়গার সমস্যা তার উপড়ে কে আবার অন্যের ঝামেলা মাথায় নিতে চায়। আর পাখীতো এ বাসায় কাজ করার জন্যও আসেনি, উলটো আরো ঘরের কাজের লোকদের গার্মেন্টসের নামে নষ্ট করার ধান্দায় এসেছে। পাখী তার কথা রাখল। অতি দ্রত তার ছোটবোন আর খালার নেটওয়ার্কের সাহায্যে একটা গার্মেন্টসে চাকুরী জোগাড় করে ফেলল। বস্তিতে ঘর ও ভাড়া করল। মনিব বাড়ীর সাহায্যে ছেলেকে একটা সরকারী স্কুলেও ভর্তি করে দিলো। পাখী সারাদিন গার্মেন্টসে, ছেলে স্কুল থেকে এসে মনিব বাড়ীতে রোজ রোজ ঘুরঘুর করে, যাবার জায়গা নেই। আট ঘন্টার কাজের কথা থাকলেও রোজই প্রায় ওভারটাইম থাকে পাখীর আর ওভারটাইম মোটামুটি বাধ্যতামুলক। দশ ঘন্টা, বারো ঘন্টা কাজের পর আবার নিজের বাজার, রান্না, খাওয়া পাখী অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে গেলো। দেশ থেকে পাখীর মাকে আনালো ছেলের দেখাশোনা আর রান্না খাওয়ার জন্য। কিন্তু বস্তিতে ঘর ভাড়া, নিজেদের খাওয়া পরা, ছেলের স্কুলের খরচ সবতো পাখীর এই চাকুরীতে কুলায় না, তারউপর বড়মানুষ স্বামী যখন তখন চাকুরীয়া বউ এর উপর এসে পয়সার জন্য হামলা চালায়। আবার পাখী অসুস্থ থাকলে বেতন কেটে রাখে গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ। পাখী মরিয়া হয়ে উঠল এবার। আশে পাশে সব জায়গায় একটা ভালো কাজের সন্ধান করতে লাগল পাগলের মতো। সন্ধানে কি না মিলে? পাখীরও মিলল সেই সোনার হরিনের খোজ। একজন খোজ এনে দিল কোথায় যেনো বিদেশে কাজের লোক নেয়া হবে। বেতন বেশ ভালো, আর থাকা খাওয়াতো ফ্রী। বিদেশের ভালো খাওয়া-দাওয়া আর অনেক অনেক ভালো থাকার সুযোগ। পাখীর জীবন ই অন্যরকম হয়ে যাবে। যে জীবনের স্বপ্ন পাখী জীবনভোর দেখে এসেছে। পাখী পাগলের মতো ছুটল সেখানে। ইন্টারভিউ দিল এবং সিলেক্টও হোল। আরম্ভ হলো পাখীর জীবন সংগ্রামের আর একটি অধ্যায়। স্বামী সন্তান সবাই অনেক খুশী, মা অন্তত সুখ এনে দিতে সাগর পাড়ি দিচ্ছে, তাদের আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না, তারাও বড়লোক হবে আর আরাম আয়েসের দিন কাটাবে। পাগলের মতো পুরনো মনিবের হাতে পায়ে ধরে, স্বামীর ভিটে বন্ধক রেখে পাখী যাওয়ার টাকা যোগাড় করল কোন রকমে। তারপর পাখী ছেলেকে স্বামীর কাছে রেখে অনেক আশা নিয়ে উড়ল আকাশে। সাত সমুদ্র না হোক তবুও সমুদ্র পেরিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে হলো পাখীর যাত্রা। সোনার হরিনকে কয়েদ করবে বলে।

দুবাইতে পাখীর জীবন কাটল মোটামুটি নির্বিঘ্নেই। পাখী মন দিয়ে তার মনিব পরিবারের সেবা করল, একটু একটু আরবীতো পাখীকে দুবাই যাওয়ার আগেই শিখতে হয়েছিল, টেনিং এর সময়। সেখানে যেয়ে আরো ভালো করে ভাষা রপ্ত করল। নিজের ছোটবোনকে দুবাই নেয়ার ব্যবস্থাও করল এরমধ্যে। মাঝে মাঝেই মনিব বাড়িতে ফোন করে স্বামী ছেলের সাথে কথা বলত। স্বামী ভিটে, জমি ছাড়িয়ে নিল মহাজন থেকে। মনিবের ঋণও দেয়া শেষ। পাখী যত টাকা পাঠাতো শুধু স্বামীকে বলত তুমি দেশে এক টুকরা জমি কিনো, গরু কিনো, গাভী আর হাস-মুরগী কিনো। আর বাকী টাকা ব্যংক এ রাখো। ছেলেকে বলত তুই মন দিয়ে পড় বাবা তোকে অনেক বড় হতে হবে। স্বামী আর ছেলে পাখীকে সান্ত্বনা দিতো এই বলে যে

পাখীর কথামতোই সব কাজ হচ্ছে। পাখীকে কিচ্ছুই ভাবতে হবে না। কেউ বাংলাদেশে এলে গেলে পাখী তাদের হাতে পায়ে ধরে স্বামী ছেলের জন্য এটা সেটা পাঠায়। ছেলেও নানান সৌখিন জিনিসের আবদার করত মায়ের কাছে মা একটা ক্যামেরা পাঠাও কিংবা একটা দামী পারফিউম বা সানগ্লাস। সে সমস্ত আবদার পাখী রক্ষা করতো এই ভেবে যে আহারে মা কাছে নেই ছেলেটা এমনিতেই না জানি কতো কষ্ট পাচ্ছে। পাখী দুবাই সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করলেও রাতের বেলায় ঘুমাতে পারত না, সারারাত পাখীর দুচোখ জুড়ে থাকত বাড়ী ফেরার স্বপ্ন। নিজের একটা ছোট্ট সংসারের স্বপ্ন। একটানা সাত বছর দুবাই এ পরিচারিকার কাজ করে, মনের মতো জিনিসপত্র, উপহার নিয়ে পাখী উড়ল এবার দেশের পানে। এবার আর বাধা নেই। জমি আছে, গরু আছে, হাস-মুরগী আছে। এবার মনের আশ মিটিয়ে সত্যি সংসার করবে। অজানা সুখের কথা ভেবে সারা শরীরে শিহরন জাগে পাখীর। কতোদিন পর স্বামী পুত্রকে কাছে পাবে সে। আবার একসাথে থাকবে তারা। যে জীবনের স্বপ্ন ছোটবেলা দেখে এসেছে এতদিনে তা হাতের মুঠোয় ধরা দেবে। স্বপ্নমাখা চোখ নিয়ে পাখী এসে নামল। পাখীর পরিবারের লোকদের মধ্যে খুশীর বন্যা বয়ে গেলো, পাখীকে কাছে পেয়ে। অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল এই হতে পারত শেষটা কিন্তু শেষ কি কখনও হয় পাখীদের সংগ্রাম? যেখানে পদে পদে সবাই ঠকানোর জন্য তৈরী সেখানে সরলা পাখীদের সারা জীবন দুঃখের অকুল দরিয়ায় ভাসা ছাড়া উপায় কি?

বাড়ী ফিরল পাখী, প্রথম কদিন বেড়ানো, সবার সাথে দেখা করা, উপহার দেয়া কুশল বিনিময় করার হুড়োহুড়িতেই গেলো। এর মাঝেও পাখী কয়েকবার ছেলেকে তার পড়ার কথা জিজ্ঞেস করল, কতদুর পাশ দিলো আর কতদিন লাগবে? ছেলে একথায় ওকথায় এ বাহানায় ওবাহানায় সব প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতো। এরপর পাখী স্বামীকে বারবার তাগাদা দিতে লাগল দেশে যাবে, জমি দেখবে। পাখীরা এতোদিন ঢাকাতে আছে দেশের জমির, গরুর, হাস-মুরগীর কি হাল? স্বামীও বলত হবে হবে সব। মাত্রতো এলে এতোদিন খাটাখাটুনীর পর, কদিন বিশ্রাম নাও। তারপরও পাখীর মন মানতো না। ঢাকাতে এ কার বাসা? স্বামীতো দেশে থাকে আর ছেলেতো কোথাও মেসে থেকে পড়ে। এ বাসায় তার পাঠানো টুইন ওয়ান, ক্যমেরা আছে কিন্তু সাথে আছে রঙ্গীন টিভি, ছোট ফ্রীজ এগুলো কার? রোজ এতো বাজার করে আনে তার স্বামী ছেলে এতো অন্যান্য খরচা করে এতো টাকা কি আয় হয় ওদের রোজ? পাখীর কেমন যেনো দ্বন্দ্ব লাগলো। পাখী রোজ স্বামীকে পাঠানো টাকার হিসাব দিতে বলতে লাগল, জমির, গরুর কথা, ঢাকার বাসা এবং বাসার খরচের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল, স্বামী ছেলে পাখীকে এড়াতে শুরু করল। পাশের বাসা থেকে পাখী জানতে পেলো এ বাসা পাখীর স্বামীর ই। ঘরের এই মালামাল পাখীর। পাখীর স্বামী ছেলে কখনই গ্রামে যায় না, সারাদিন টিভি দেখে খেয়ে ঘুরে কাটায়। ছেলের পড়াশোনার সাথে কোন সর্ম্পক নেই, মা যাওয়ার দু-এক বছরের মধ্যেই সে সর্ম্পকের ইতি ঘটেছে। পাখীর মাথায় বজ্রপাত হোল। পাখী অন্যসব বাদ দিয়ে তার রক্তমাংস দিয়ে আয় করা টাকার জন্য মরীয়া হয়ে ছেলে আর স্বামীর পিছনে লাগল কিন্তু তারা কোন হিসাব দিতে পারছে না। এদিকে রোজ রোজকার হিসাবের তাগাদায় আর জেরায় পাখীর স্বামী আর ছেলেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে হাতাহাতিও হয়ে যেতো পাখীর তার স্বামীর সাথে এটা নিয়ে। পাখী কবে আবার দুবাই ফেরত যাবে নানাকৌশলে সেখবর জানতে তৎপর হয় পাখীর স্বামী আর ছেলে। যখন জানতে পেলো পাখী পাকাপাকি ভাবে চলে এসেছে আর দুবাই যাবে না তখন বাপ-বেটা রেগে আগুন। কি করে সম্ভব এটা? সোনার ডিম দেয়া হাস আর ডিম দেবে না? পাখীকে নানাভাবে দুবাই ফিরে যাওয়ার জন্য বোঝানো হলো কিন্তু এবার পাখী অনঢ়। অতিষ্ঠ হয়ে গেলো পাখীর স্বামী ছেলে। পাখীর নিয়ে আসা টাকাও ফুরিয়ে গেছে, হাতও খালি, টাকা যোগাড় করে দেয়ারতো নাম নেইই তারউপর আবার সারাক্ষন পুরোনো হিসেব চায়। বাপ-বেটা মিলে পাখীকে বেদম মার দিলো, ধরারতো কেউ ছিলো না, মাথা ফাটা রক্তাত পাখীকে হাসপাতাল ফেলে দিয়ে তারা উধাও হয়ে গেলো।

কৈ মাছের জান পাখীর, শরীরের সব ব্যথা সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠল আবার ধীরে ধীরে। কিন্তু মনের কষ্টের খবর কে রাখে? সে কষ্ট কি কোনদিনও সেরে উঠার? এ কদিনে কেউ যায়নি হাসপাতাল পাখীকে একটি বারের জন্য দেখতে বা খোজ নিতে। হয়ত পুলিশের ভয় পেয়েছিল বা অন্যকিছু কে জানে? সুস্থ হয়ে পাখী মনিব বাড়িতে আসল নিজের দুঃখের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করল পাখীর খালাম্মাকে (মনিব গিন্নীকে) । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি করবি তুই পাখী? পাখীর তখন সংসারের প্রতি অসীম বিতৃষ-া, মনে বিরাজ করছে অসীম বৈরাগ্য। বলল, খালাম্মা যেদিক দুচোখ যায় চলে যাব, একটাই পেট আমার, আমি আর নিজের জন্য কিংবা কারো জন্যই ভাবি না। মনিবগিন্নী পাখীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তখনের মতো ঠান্ডা করলেন। কিন্তু পাখী কিছুতেই মনিবগিন্নীর বাসায় থাকতে রাজী হলো না, পাখী জানে তার স্বামী সন্তান যদি কখনও তাকে খুজতে আসে তো প্রথম কোথায় আসবে। পাখী কিছুতেই আর তার স্বামী সন্তানের মুখ দেখতে রাজী না। কোথায় যাবে, কি করবে দিনরাত পাগলের ভাবতো মতো একা বসে। পাখীর

মনিবগিন্নী পাখীর অবস্থা দেখে বলল তুই আবার দুবাই চলে যা পাখী টাকার ব্যবস্থা আমি করে দিব। পাখী বলল আর কি জন্য কেনো যাবো দুবাই খালাম্মা? তাছাড়া ওরা বড্ড খাটায়, একদন্ড বসতে দেয় না। পাখী আর কিছুতেই ঢাকায় থাকবে না, এমন অজানায় হারাবে যাতে স্বামী-সন্তান আর কোনদিন খুজে না পায়। একদিন পাখী সত্যি সত্যি অজানার উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ল। এখন পাখী আছে বাংলাদেশের কোন এক কোনায় নিজেকে লুকিয়ে, নিজের ব্যথা লুকাতে নিজেই লুকিয়ে পড়ল পাখী। এক চাকুরীকরা মেমসাহেবের বাচ্চার দেখাশোনার ভার নিয়েছে পাখী নিজের উপর। হতাশ মনের পাখী যে নিজের প্রদীপকে আলো দেখাতে পারেনি সে আজ অন্যের প্রদীপকে আলো দেখাতে প্রাণপাত করছে। মাঝে মাঝে পাখী ফোন করে খালাম্মার কাছে, এমনি সবাই কেমন আছে জানতে। পাখীর ধারণা সঠিক ছিলো, সোনার ডিম দেয়া হাস কোথায় লুকালো সে খোজ নিতে স্বামী সন্তান এসেছিলো পাখীর মনিবের বাড়ী। কোন খোজ না পেয়ে পাখীর স্বামী অনেক রাগারাগিও করল মনিব গিন্নীর সাথে, পাখীর স্বামীও জানেন খালাম্মা খোজ জানবেন না তা হতেই পারে না। কিন্তু কি করে মনিব গিন্নী কাউকে পাখীর খোজ দিবেন? পাখী যে তাকে কসম দিয়ে বলে গেছে আমি মরে গেলে আমার লাশ শুধু আপনি পাবেন খালাম্মা আর কেউ না, এতো বড় বিশ্বাস পাখীর উনি ভাঙ্গেন কি করে? দুঃখে যে বনবাসিনী হয়েছে আজ তাকে কেনো আর বিরক্ত করা? সেতো চাওয়া পাওয়ার হিসাবের খাতা বন্ধ করে দিয়েই চলে গেছে। এতটুকু নিশ্চন্ততার সোনার হরিনের খোজ তাকে সারা পৃথিবী তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল কিন্তু কখনও ধরা দিল না।

অনেকে গল্প বা উপন্যাসের শেষে উপসংহার দেয়াকে গল্প বা উপন্যাসের দুর্বলতা বলে ধরেন, ধরুন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কারণ এটি কোন গল্প বা উপন্যাস নয়, এটি সংগ্রামী পাখীর সত্য জীবনালেখ্য। আর আমি এটাও লিখলাম না, এ সর্ম্পুন কাল্পনিক ঘটনা মাত্র কারো জীবনের সাথে মিল পাওয়া নিতান্তই কাকতালীয় কারণ পাখীর পক্ষে কম্পিউটার অন করে নিজের জীবন কথা পড়া একটি কল্পনীয় দৃশ্য মাত্র আর এ কল্পনীয় দৃশ্য যদি কোনদিন বাস্তবও হয় পাখী হয়তো তার জীবন কথা লিখার ও ছাপার অপরাধ থেকে তার বড় আপাকে মুক্তি দিবে।

তানবীরা তালুকদার।
০৮।০৩।০৬